সাম্যবাদ

‘বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)’-এর মুখপত্র

১৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-২০২৬ | website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org | মূল্য ৫ টাকা

সর্বসম্মত সংস্কারগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন কর

সংসদ নয়, জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই সকল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার একমাত্র গ্যারান্টি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দেশের মানুষ এক নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার সম্মুখীন। একদিকে সংসদে গণতন্ত্রের ভাষা উচ্চারিত হচ্ছে, অন্যদিকে সেই গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার যে সংস্কার প্রক্রিয়া – সেটিই অনিশ্চয়তার জালে আটকে যাচ্ছে। সরকারি দল বিএনপি নির্বাচনের আগে সংস্কারের ৩১ দফা জনগণের সামনে তুলে ধরেছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাদের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ও আচরণ জনগণের মনে সংশয় তৈরি করছে। বিরোধী দলও সংস্কারকে রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করছে। ফলে জনগণের আকাঙ্ক্ষিত সংস্কারের বাস্তবায়ন নিয়েই গভীর সংশয় তৈরি হয়েছে।

যদি জনগণের আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত হয়, যদি সংস্কার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়, তাহলে সেই অসন্তোষ একসময় আন্দোলনে রূপ নেবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বারবার এই সত্য প্রমাণ করেছে।

জুলাই সনদ হওয়ার কথা ছিল ঐকমত্যের দলিল। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় সনদ গৃহীত হয়েছে খোদ সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই অনৈক্যের বীজ রোপিত হয়েছিল। আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের মধ্যে রাষ্ট্র কাঠামোর গণতান্ত্রিক সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা বারবার ব্যক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে যে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, জবাবদিহিতার অভাব এবং গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার হরণ, তার বিরুদ্ধে একটি কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরেই আলোচিত ছিল। রাষ্ট্র তার প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবহার করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের উপর নিপীড়ন, বাকস্বাধীনতা হরণ, গুম, প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণসহ যে সমস্যাগুলো দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল তার সংস্কার করে সংবিধানের আরও গণতন্ত্রীকরণের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ফলে গণঅভ্যুত্থানের পর এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন এবং তার মাধ্যমে একটি সংস্কার সনদ প্রণয়নের উদ্যোগ মানুষের মধ্যে নতুন আশার জন্ম দিয়েছিল।

কমিশনের কাজ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য পথ খুঁজে বের করা। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ‘ঐকমত্য’–অর্থাৎ এমন একটি ভিত্তি, যেখানে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কিছু মৌলিক বিষয়ে সবাই একমত হতে পারে। এই ধারণাটিই জুলাই সনদের মূল শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এই শক্তিটিই সবচেয়ে বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

দীর্ঘ আলোচনার পর যে দলিল সামনে আনা হলো, সেখানে ঐকমত্য এবং মতবিরোধ – দুটোকেই একসাথে জুড়ে দেওয়া হলো। ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর মাধ্যমে ভিন্নমতগুলোকে স্বীকার করা হলেও, পুরো প্যাকেজটিকে একটি ঐকমত্যের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এর ফলে একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসে – ঐকমত্য কি সত্যিই অর্জিত হয়েছিল, নাকি সেটিকে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে সনদের ভেতরের কাঠামোর দিকে তাকাতে হয়। একদিকে সনদের অঙ্গীকারনামায় বলা হয়েছে যে, এটি একটি নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল এবং এর পূর্ণ

● এরপর ৩য় পৃষ্ঠায়

অধ্যাদেশ থেকে আইন

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ই দখল হচ্ছে সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

আওয়ামী লীগের শাসনামলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্লজ্জ দলীয়করণ ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তাই রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রীকরণের অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার দাবি উঠে। বিশেষ করে বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সায়ত্বশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি সামনে আসে।

অভ্যুত্থানের পরে গঠিত অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রায় ১৮ মাস ক্ষমতায় ছিল। তারা এই সময়ে ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করে। কিছু অধ্যাদেশ ছিল প্রশ্নবিদ্ধ কিংবা ত্রুটিপূর্ণ। আবার কিছু অধ্যাদেশ জারি হয়েছিল যা গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে উত্থাপিত সংস্কার আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এইসকল অধ্যাদেশের আইনী ভিত্তি প্রসঙ্গে সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– “পরবর্তী নির্বাচিত সংসদ অধিবেশনের প্রথম বৈঠকেই অধ্যাদেশসমূহ উপস্থাপন করতে হবে। সংসদ চাইলে তা পাস করতে পারে বা বাতিল করতে পারে। সংসদ বসার ৩০ দিনের মধ্যে অনুমোদন না পেলে অধ্যাদেশটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।”

যে সংস্কার উদ্যোগগুলো রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও স্বাধীন ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য দরকার, তার অনেকগুলো বাস্তবায়নের আগেই থেমে যাচ্ছে। এর ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় জবাবদিহির প্রশ্নগুলো আবারও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ছে।

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীতে গঠিত সংসদের প্রথম অধিবেশন এই কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি অধিবেশনের প্রথম দিনই সবগুলো অধ্যাদেশ সংসদে উত্থাপন ও পরবর্তীতে সরকারি ও বিরোধীদলের সদস্যদের যুক্ত করে একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটির দায়িত্ব ছিল অধ্যাদেশগুলো পর্যালোচনা করে গ্রহণ ও বর্জন সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদানের। গত ২রা এপ্রিল এই কমিটি তাদের সুপারিশ পেশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ৯৮টি অধ্যাদেশ হুবহু আইনে রূপান্তরের জন্য বিল উপস্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে।

যে ৯৮টি অধ্যাদেশ সরকার হুবহু পাশ করতে যাচ্ছে, তার মধ্যে কিছু অধ্যাদেশ আছে, যা নিয়ে অন্তবর্তী সরকারের সময় বিএনপি নিজেই সমালোচনা করেছিল। যেমন: বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ ও প্রশাসক নিয়োগ, সরকারি কর্মচারীরা আন্দোলনে যুক্ত থাকলে ২৮ কার্যদিবসের মধ্যে বরখাস্ত করা ইত্যাদি। যে কোন সরকারই এই আইনগুলোকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে। অথচ তারা ক্ষমতায় এসেই এগুলোকে আইনে পরিণত করলো এবং নিজেদের যথেচ্ছ ব্যবহারের পথ পরিষ্কার করলো।

বাকি ৩৫টি

● এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

আমেরিকার সাথে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত জাতীয় স্বার্থ বিরোধী বাণিজ্য চুক্তি অবিলম্বে বাতিল, চুক্তি সম্পাদনের সাথে যুক্তদের বিচার, নিউমুরিং টার্মিনাল বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা দেওয়ার পাঁয়তারা বন্ধ করার দাবিতে গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্টের উদ্যোগে ৬ এপ্রিল ২০২৬ ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে অন্তর্বর্তীকালীন ইউনূস সরকারের আমলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সম্পাদিত বৈষম্যমূলক ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী ‘রিসিপ্রোকাল ট্রেড এগ্রিমেন্ট’ (RTA) বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ। বক্তব্য রাখেন, সিপিবির সভাপতি সাজ্জাদ জহির চন্দন। সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবীর জাহিদ, বাসদ (মাহবুব) সাধারণ সম্পাদক হারুনার রশীদ ভূইয়া, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশ জাসদের কেন্দ্রীয় নেতা রুকনুজ্জামান রোকন, সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী, জাতীয় গণফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা

● এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ই দখল হচ্ছে সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাদেশের জন্য তিন ধরনের পরিণতি সুপারিশ করা হলো:

১. এখনই রহিত করা হবে ৪টি অধ্যাদেশ

২. পরবর্তীতে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে বিল হিসেবে উত্থাপন করা হবে ১৬টি অধ্যাদেশ

৩. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশোধিত আকারে বিল হিসেবে উপস্থাপন করা হবে ১৫টি অধ্যাদেশ

ফলে নিয়ম অনুযায়ী গ্রহণ না করায় বর্তমানে এই ৩৫টি অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারিয়েছে।

১.

যে ৪টি অধ্যাদেশ এখনই রহিত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ ও সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ। এগুলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারেও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, পৃথক সচিবালয়– এই বিষয়গুলোর উল্লেখ আছে। বিদ্যমান সংবিধান অনুসারে উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করে।

এই অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে, অধ্যাদেশ জারি করে বিচারপতি নিয়োগের এই ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগের হাত থেকে সরিয়ে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হয়। এই কাউন্সিল বিচারপতি পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের বাছাই করবে এবং তাদের নাম রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবে। এই প্রস্তাবকে প্রধান বিচারপতির পরামর্শ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী বিচারপতি নিয়োগ দেবেন। অর্থাৎ, বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়াটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে এনে তা সরকার প্রধানের সরাসরি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশটিকে আইনে রূপান্তর করা হচ্ছে না। ফলে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগ আবারও কার্যত প্রধানমন্ত্রীর হাতেই থেকে যাচ্ছে।

একইভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নিম্ন আদালতের বিচারকদের চাকরি, বদলি ও পদোন্নতির নিয়ন্ত্রণ আইন মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে প্রধান বিচারপতির হাতে দেওয়ার যে অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল, সেটিও বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে নিম্ন আদালতের বিচারকদের ওপর নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকছে, যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য একটি বড় বাধা হিসেবে বিবেচিত হয়।

২.

যে ১৬টি অধ্যাদেশ পরবর্তীতে যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে বিল উত্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে– এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও গুম সংক্রান্ত অধ্যাদেশ।

গুম সংক্রান্ত অধ্যাদেশে গুমকে একটি 'চলমান অপরাধ' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এর সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারণ করা হয় মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। বিএনপি জাতীয় নিরাপত্তার কারণে আটকের ঘটনাকে গুমের সংজ্ঞা থেকে বাদ দিতে চায়। সেই সঙ্গে গুমের অভিযোগে নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে তদন্তে সরকারের পূর্বানুমতি নেয়ার বিধান যুক্ত করতে চায়। গুমের ঘটনা ঘটায় নিরাপত্তা বাহিনী, নির্দেশ দেয় সরকার। গুম সংক্রান্ত অভিযোগ বাস্তবে এই দুই পক্ষের বিরুদ্ধেই হয়। এ থেকে জনগণকে সুরক্ষা দেয়ার জন্যই গুম সংক্রান্ত অধ্যাদেশ। নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে সরকারের অনুমতি নেয়ার বিধান রাখা মানে এই অধ্যাদেশকেই অকার্যকর করা। রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারীতা খর্ব করার যে আকাঙ্ক্ষা গণঅভ্যুত্থানে ঘোষিত হয়েছিল– এটা তার সম্পূর্ণ বিরোধী।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী, কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে গুম, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করতে পারত। পাশাপাশি এসব বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত স্থান পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় নথি তলব করার ক্ষমতাও কমিশনকে দেওয়া হয়েছিল। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সরকারের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে একটি সার্চ কমিটি গঠনের বিধান করা হয়েছিল, যাতে সরকার ইচ্ছামতো তাদের নিয়োগ বা অপসারণ করতে না পারে। এমনকি চেয়ারম্যানকে অপসারণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের মতো কঠোর পদ্ধতি অনুসরণের কথাও বলা হয়েছিল, যা কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। সরকারের এর সবগুলো বিষয়েই আপত্তি। তারা নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে তদন্তে সরকারের পূর্বানুমতির বিধান যুক্ত করতে চান এবং এই কমিশনকে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত করতে চান।

দুদক সংক্রান্ত অধ্যাদেশে দুদকে কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে সাত সদস্যের বাছাই কমিটি গঠন করার বিধান করা হয়েছিল। বিধানে ছিল যে, এই বাছাই কমিটিতে অন্তত তিনজন সরকারি প্রতিনিধি থাকবেন। বিএনপি সরকার বাছাই কমিটিতে আরও বেশি সরকারি প্রতিনিধি যুক্ত করতে চায়। সাত সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটিতে তিনজনের বেশি সরকারি প্রতিনিধি থাকার অর্থ হলো, কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করা, যাতে সরকারের পছন্দের ব্যক্তিরাই দুদকের কমিশনার হন। এতে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করা সম্ভব হবে না।

৩.

যে ১৫টি অধ্যাদেশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধনের মধ্য দিয়ে পরবর্তীতে উত্থাপন করা হবে বলা হচ্ছে, তার মধ্যে আছে– বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ব্যাংক রেজোল্যুশন অধ্যাদেশ ও পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ। গণতান্ত্রিক সংস্কারে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু অধ্যাদেশ আছে যা সমালোচনামুক্ত নয়, কিন্তু আগের আইনের চেয়ে ভাল। যেমন– শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ। এই অধ্যাদেশে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি বা এ সম্পর্কিত কোন বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করা হয়নি। শ্রমিক ছাঁটাইয়ে মালিকের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে শ্রমিকদের নিরাপত্তাও এই অধ্যাদেশ দেয়নি। কিন্তু এই অধ্যাদেশে ৫ বছরের বদলে প্রতি ৩ বছর পরপর ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের বিধান করা হয়েছে। ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ও প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন শ্রমিক থাকলে ভবিষ্য তহবিল গঠন বাধ্যতামূলক করার বিধান করা হয়েছে। নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১১২ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২০ দিন করা হয়েছে। শ্রমিকদের কালোতালিকাভুক্ত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একটি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ৫টি ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দেয়া হয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও শ্রমিকের সংজ্ঞায় নিয়ে আসা হয়েছে।

দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও শ্রমিক-কৃষক অধ্যুষিত এই দেশে শ্রম আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শ্রমিকরা অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলেও বছরের পর বছর ধরে তারা অবহেলিত। কিন্তু গত ১৩ এপ্রিল শ্রম অধ্যাদেশ সংশোধন করে আইন পাশ করা হলো এবং সেটা হলো ত্রিপক্ষীয় বৈঠক ছাড়াই। এটা আইএলও সনদের গুরুতর লঙ্ঘন। শ্রম সংস্কার কমিশনের সভাপতি বলেছেন যে, সংশোধিত শ্রম আইনে মালিকদের স্বার্থই রক্ষা করা হয়েছে, তাদের আপত্তিগুলো বিবেচনায় নিয়েই সংশোধন করা হয়েছে। এতে একটি প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৫টি থেকে কমিয়ে ৩টি করা হয়েছে। শ্রমিকের সংজ্ঞা থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাদ দেয়া হয়েছে।

একইভাবে ব্যাংক রেজোল্যুশন অধ্যাদেশ সংশোধন করে যে আইন করা হয়েছে, তাতে শেখ হাসিনার আমলের ব্যাংক লুটপাটকারী ব্যাংক মালিকদের ওই সকল ব্যাংকে পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। নতুন আইনের ১৮(ক) ধারা অনুযায়ী, দুর্বল ও একীভূত হওয়া ব্যাংকগুলোর আগের মালিক/পরিচালকরা মাত্র ৭.৫% অগ্রিম অর্থ জমা দিয়ে ব্যাংকের মালিকানা ফিরে পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। বাকি অর্থ ২ বছরে ১০% সুদে পরিশোধের সুযোগ রাখা হয়েছে। এটি এক কথায় দেশের অর্থ 'লুটপাটকারীদের পুরস্কৃত করা'।

একইভাবে সংশোধন করা হবে পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ যেখানে পুলিশ বিভাগের জন্য আলাদা একটি কমিশন গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তাকে পুলিশ সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পুলিশের সমস্ত দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হাতে রাখা হয়নি। এসব অধ্যাদেশ সংশোধন করে বিল আনার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এসব অধ্যাদেশের কোথায় কী ধরনের সংশোধনী আনা হবে, তা বিশেষ কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

এই পুরো প্রক্রিয়াটি দেখলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়– যে সংস্কার উদ্যোগগুলো রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও স্বাধীন ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য দরকার, তার অনেকগুলো বাস্তবায়নের আগেই থেমে যাচ্ছে। এর ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় জবাবদিহির প্রশ্নগুলো আবারও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ছে। অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে অধ্যাদেশগুলো সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে সেগুলো আইনে রূপান্তরের সুপারিশ আর যেগুলো সরকারের জবাবদিহিতার জন্য জরুরি সেগুলো বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে।

অর্থাৎ মুখে যা-ই বলা হোক না কেন, রাষ্ট্রের দমনের ক্ষমতাকে আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আমরা অভ্যুত্থানের আগেই আমাদের বিভিন্ন লেখায় বলেছিলাম– ফ্যাসিবাদ কোন দল আনে না, আনে শ্রেণি। আওয়ামী লীগের পতন ঘটলেই ফ্যাসিবাদের পতন ঘটবে না। কারণ সেই পুঁজিপতি-শিল্পপতি শ্রেণি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন। আজকের যুগে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পুঁজিপতি শ্রেণি কোনভাবেই মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তার নাগরিক অধিকার সুরক্ষা করতে পারে না। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উন্নত, অনুন্নত, ছোট, বড় যে কোন পুঁজিবাদী দেশকেই আজ রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে নির্মমভাবে ব্যবহার করতে হয়, ফ্যাসিবাদী কায়দা গ্রহণ করতে হয়। আজকের যুগে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে কেউ দেশ চালাবে, অথচ জনগণকে অবাধ গণতন্ত্র চর্চা করার সুযোগ দেবে– এমন উপায় নেই। সংসদে বিরোধীদের আসনে বসে যারা আজ গণতন্ত্রের জন্য নরম চোখের জল ফেলছেন, তারাও ক্ষমতায় গেলে এই কাজই করতেন। এটাই আজকের দিনে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক পথে দেশ চালানোর পরিণতি।

আমেরিকার সাথে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমিরুন নুজহাত মনীষা, সমাবেশে বক্তারা বলেন, এটি একটি কৌশলগত অধীনতার দলিল। চুক্তির ৪.১ ধারায় বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি জাতীয় নিরাপত্তার কারণে কোনো দেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা বা শুল্ক আরোপ করে, তাহলে বাংলাদেশকে 'পরিপূরক বিধিনিষেধ' গ্রহণ করতে হবে। এর অর্থ হলো, আমেরিকা চীন বা রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিলে বাংলাদেশকেও তাতে যোগ দিতে বাধ্য করা যাবে – যা বাংলাদেশের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সরাসরি লঙ্ঘন। এছাড়া চুক্তির ৫.২ ধারায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এমন কোনো ডিজিটাল বাণিজ্য চুক্তি করতে পারবে না যা মার্কিন স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে। ৪.৩(৪) ধারায় বলা আছে, বাংলাদেশ যদি চীন বা রাশিয়ার সাথে কোনো মুক্তবাণিজ্য চুক্তি করে যা এই চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি বাতিল করে পুনরায় দণ্ডমূলক শুল্ক আরোপ করতে পারবে। এর মানে হলো বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি এখন ওয়াশিংটনের ভেটো-ক্ষমতার অধীনে চলে যাবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর খলিলুর রহমান ঘোষণা দিয়েছেন–'এটি খুব ভালো চুক্তি' এবং 'দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে চুক্তি হয়নি।' তিনি আরও দাবি করেছেন যে, নির্বাচনের আগে বিএনপি ও জামায়াতের শীর্ষ নেতৃত্বের সম্মতি দিয়ে এই চুক্তি করা হয়েছে–অর্থাৎ বিএনপি ও জামায়াত এই দেশবিক্রির বিষয়ে 'সম্মতি' দিয়েছিল। তাই বিএনপি সরকারকে অবিলম্বে এই চুক্তি বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।

সাম্যবাদ
১৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-২০২৬

সাম্রাজ্যবাদ যত দিন থাকবে তত দিন যুদ্ধের সম্ভাবনাও থাকবে

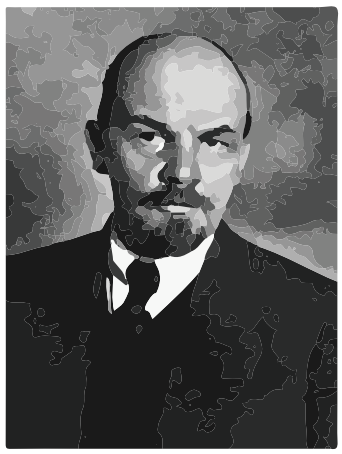

সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রকে অস্বীকার করতে চায়, জাতীয় প্রশ্নেও (জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অর্থে) সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রকে অস্বীকার করতে চায়, পদদলিত করতে চায়। সাম্রাজ্যবাদ গড়ে উঠলে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করা, অর্থাৎ স্বাধীন প্রজাতন্ত্র গঠন, সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি, জনসাধারণের দ্বারা প্রশাসক নির্বাচিত করা এই সমস্ত কিছু একই মাত্রায় এবং একই ভাবে অর্জন করা প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিবাদের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। একচেটিয়া কারবার, ধনকুবের গোষ্ঠী, স্বাধীনতার বদলে শক্তিশালী জাতির দ্বারা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ছোট ছোট ও দুর্বল জাতির শোষণ এই গুলি সাম্রাজ্যবাদের সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তৈরি করেছে, যা দেখে আমরা তাকে পরজীবী বা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করতে বাধ্য।

অর্থনৈতিক দিক থেকে একচেটিয়া পুঁজিবাদই হল সাম্রাজ্যবাদ। একচেটিয়া পুঁজির চরিত্র সম্পূর্ণ ভাবে অর্জন করতে হলে সমস্ত রকম প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাতেই হয় এবং তা শুধু দেশীয় বাজারেই (বিশেষ দেশের) নয়, বিশ্ব জুড়ে বিদেশের বাজারেও ঘটাতে হবে। এই লগ্নিপুঁজির যুগে বিদেশি রাষ্ট্রের বাজারেও সমস্ত প্রতিযোগিতার অবসান ঘটানো কি অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব। প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিকে অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীল করে তোলা, তার কাঁচামালের উৎসগুলিকে দখল করা এবং এই ভাবে তার সমস্ত শিল্পগুলিকে গ্রাস করার মধ্য দিয়েই তা করা হয়ে থাকে।

মার্কিন ট্রাস্টগুলিই সাম্রাজ্যবাদ অথবা একচেটিয়া পুঁজিবাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে চিহ্নিত করছে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য তারা যে নানা কৌশল অবলম্বন করে তা শুধু অর্থনৈতিক দিকেই সীমাবদ্ধ রাখে না তারা প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক, এমনকি অপরাধমূলক অপকর্মের আশ্রয় নেয়। এই ট্রাস্টগুলি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নানা কৌশল প্রয়োগ করে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করতে পারে না, এ রকম ভাবা চূড়ান্ত ভুল হবে। এটা যে বাস্তবে সম্ভব তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ট্রাস্টগুলি ব্যাঙ্কসমূহ (ট্রাস্টের মালিকেরা শেয়ার কিনতে কিনতে ধীরে ধীরে ব্যাঙ্কের মালিক হয়ে বসে) নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়োজিত পুঁজিকে ক্রমাগত দুর্বল করে। তাদের কাঁচামালের সরবরাহ কমিয়ে দেয় (শেয়ার কেনার মাধ্যমে ট্রাস্ট মালিকেরা রেলপথের মালিক হয়ে বসে), কখনও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীকে বরবাদ করে দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান দিয়েও তারা সস্তায় পণ্য বিক্রি করে এবং শেষ পর্যন্ত তার শিল্পকারখানা, কাঁচামালের উৎস (খনি, জমি-জায়গা প্রভৃতি) কিনে নেয়।

এই ভাবে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ট্রাস্টগুলির ক্ষমতা এবং তাদের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে বোঝা যাচ্ছে। আরও বোঝা যাচ্ছে যে, কী ভাবে তারা কারখানা, কাঁচামালের উৎস প্রভৃতি কিনে নেওয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক পথেই নিজেদের সম্প্রসারণ ঘটাতে থাকে। এক দেশের বৃহৎ লগ্নিপুঁজি রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন অপর কোনও দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিগুলোকে এই ভাবে গ্রাস করে ফেলতে পারে এবং প্রতিনিয়ত তা করে থাকে। এটা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ভাবেই করা সম্ভব। রাজনৈতিক ভাবে কোনও দেশ অধিকার না করেও অর্থনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলা সম্ভব এবং তা ব্যাপক ভাবে করা হয়ে থাকে। সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক নানা পত্রপত্রিকায় প্রায় এ ধরনের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন, আর্জেন্টিনা বাস্তবে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক উপনিবেশ, বা পর্তুগাল বাস্তবে ব্রিটেনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ইত্যাদি। বাস্তবত এগুলো তা-ই। ব্রিটেনের কাছে ঋণ, ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলোর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা, রেলপথ, খনি এবং জমিতে ব্রিটিশ মালিকানা প্রভৃতির মাধ্যমে এই দেশগুলোর রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ না করেও অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্রিটেন এই দেশগুলোর উপর অধিকার কায়েম করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদ এই রাজনৈতিক স্বাধীনতাও খর্ব করতে চায়। তার কারণ হল, রাজনৈতিক দখলদারি থাকলে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার অধিকতর সহজ, সস্তা, বেশি সুবিধাজনক এবং অনায়াসলব্ধ হয়ে যায়। যেমন, সহজে উচ্চ পদাধিকারীদের ঘুষ দিয়ে কিনে নেওয়া, নানা সুযোগসুবিধা আদায় করা, সুবিধাজনক আইন প্রণয়ন করিয়ে নেওয়া প্রভৃতি। সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রের বদলে খুবই অল্পসংখ্যক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর এবং বিংশ শতাব্দীতেই পুঁজিবাদ সেই স্তরে উপনীত হয়েছে। পূর্বতন জাতীয় রাষ্ট্র যা গড়ে না উঠলে সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করা সম্ভব ছিল না, সেগুলি আজ আর পুঁজিবাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। পুঁজিবাদ কেন্দ্রীকরণকে এমন ভাবে গড়ে তুলেছে যে, শিল্পের সমস্ত শাখা-প্রশাখাগুলিকে ধনকুবেরদের সিন্ডিকেট, ট্রাস্ট ও অ্যাসোসিয়েশন অধিকার করেছে এবং 'পুঁজির সম্রাটরা' হয় উপনিবেশ করে অথবা অন্য দেশগুলিকে অর্থনৈতিক শোষণের হাজার রকমের জালে আটকে প্রায় সমগ্র বিশ্বকেই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত যে পুঁজিবাদ ছিল জাতীয় মুক্তিদাতা, সেই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে এখন জাতির সবচেয়ে বড় উৎপীড়কে পরিণত হয়েছে। আগে যে পুঁজিবাদ ছিল প্রগতিশীল, আজ সে প্রতিক্রিয়াশীল। এই পুঁজিবাদ আজ উৎপাদিকা শক্তিকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করেছে যে, উপনিবেশ সৃষ্টি, একচেটিয়া ব্যবস্থা, নানা সুযোগ সুবিধা এবং জাতির উপর সমস্ত রকমের উৎপীড়নের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে কৃত্রিম ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে মানবসমাজকে হয় বছরের পর বছর, এমনকি কয়েক দশক ধরে 'বৃহৎ শক্তিগুলির' সশস্ত্র সংগ্রামের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, নতুবা তারই বিকল্প হিসাবে সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে হবে।

(সূত্রঃ সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর)

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংসদ নয়, জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই সকল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার একমাত্র গ্যারান্টি

বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। অন্যদিকে আবার বলা হয়েছে– কোনো রাজনৈতিক দল যদি নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে, তাহলে তারা নিজেদের ইশতেহার অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এই দুই অবস্থান পরস্পরবিরোধী। একটি বলছে বাধ্যবাধকতার কথা, অন্যটি দিচ্ছে নিজের ইশতেহার অনুযায়ী বাস্তবায়নের সুযোগ। ফলে সনদের প্রকৃত চরিত্রই অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। কারণ, যখন একটি দলিলের ভেতরেই দ্বৈততা থাকে, তখন সেটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল তখন নিজেদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারে। এর ফলে যে ঐকমত্য তৈরি হওয়ার কথা ছিল, সেটিই ধীরে ধীরে ভেঙে যায়।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশ জারির মাধ্যমে। ২০২৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি জারি করা 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ' নতুন করে বিতর্কের জন্ম দেয়। এই আদেশের মাধ্যমে সংস্কার প্রস্তাবগুলোকে গণভোটে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি হলো – রাষ্ট্রপতির এই ধরনের আদেশ দেওয়ার সাংবিধানিক এখতিয়ার কতটুকু?

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা নির্দিষ্ট। তিনি মূলত একটি সাংবিধানিক প্রতীকী পদ। এই অবস্থান থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি হস্তক্ষেপ কতটা বৈধতা নিয়ে আইনজ্ঞ ও রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না পাওয়ায় পুরো প্রক্রিয়াটিই বিতর্কিত হয়ে পড়ে।

এর পাশাপাশি গণভোটের পদ্ধতিও সমালোচনার মুখে পড়ে। ৪৮টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবকে একত্রে কয়েকটি পয়েন্টে সীমাবদ্ধ করে ভোটে তোলা হয়। এতে করে সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রতিটি প্রস্তাব আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। গণভোটে তখন একটি জটিল বিষয়কে সরল করার চেষ্টা হলেও, বাস্তবে এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বচ্ছতাকে ক্ষুণ্ন করেছে।

গণভোটকে ঘিরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– 'নোট অব ডিসেন্ট'-এর কার্যকারিতা। যখন সব আপত্তি উপেক্ষা করে একটি সমন্বিত ফলাফলকে বৈধতা দেওয়া হয়, তখন ভিন্নমতের গুরুত্ব কমে যায়। ফলে যে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছিল, সেটিই দুর্বল হয়ে পড়ে।

বর্তমান সংসদীয় বিতর্ক এই সংকটকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। সংসদে এখন যে ধরনের আলোচনা চলছে, তা মূলত রাজনৈতিক অবস্থান রক্ষার লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ। সরকার ও বিরোধী দল–উভয় পক্ষই নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে ব্যস্ত, কিন্তু সংস্কারের মৌলিক প্রশ্নগুলো নিয়ে গভীর ও গঠনমূলক আলোচনা খুব কমই দেখা যাচ্ছে।

সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সামনে আসা উচিত ছিল – তা হলো মৌলিক অধিকার। একটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্র নির্ধারণে নাগরিকের অধিকারই সবচেয়ে বড় মানদণ্ড। কিন্তু জুলাই সনদের আলোচনায় এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উঠে আসেনি। কেবল একটি সাধারণ বক্তব্যের মধ্যে এটিকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ করা হবে এবং তার আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। কিন্তু কীভাবে, কোন প্রক্রিয়ায়, কোন কাঠামোর মাধ্যমে–এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুপস্থিত। মোটা দাগে দুই-তিনটা কথা ছাড়া মৌলিক অধিকারগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও আইনি বাধ্যবাধকতা সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করা যায়নি।

এর পাশাপাশি সংরক্ষিত নারী আসন, জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান, ক্ষমতার ভারসাম্য – এই বিষয়গুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো শুধু রাজনৈতিক কাঠামোর অংশ নয়, বরং গণতন্ত্রের গুণগত মান নির্ধারণ করে। কিন্তু বর্তমান বিতর্কে এগুলোও যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না।

এই পুরো পরিস্থিতি আমাদের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য করে। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, তা পূরণ হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলো তখনও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে কেউই তা বাস্তবায়ন করেনি। ফলে জনগণের মধ্যে যে আস্থা তৈরি হয়েছিল, তা ভেঙে যায়। আজকের পরিস্থিতির সাথে সেই সময়ের একটি অস্বস্তিকর মিল রয়েছে।

আমরা মনে করি, সাংবিধানিক সংস্কার প্রয়োজনীয় হলেও, এটি সমাজের গভীর বৈষম্য দূর করতে পারবে না। অর্থনৈতিক কাঠামো, ক্ষমতার সম্পর্ক এবং শ্রেণিগত বৈষম্য যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে কেবল আইনি পরিবর্তন দিয়ে বাস্তব পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তবুও এই সংস্কারকে একটি প্রয়োজনীয় ধাপ হিসেবে দেখা হয়, কারণ এটি গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে পারে।

অতএব, এখন সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো – কালক্ষেপণ না করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করা। একইসাথে যে বিষয়গুলো নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, সেগুলোকে নতুন করে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসা। মৌলিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং পুরো প্রক্রিয়াটিকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা।

যদি জনগণের আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত হয়, যদি সংস্কার প্রক্রিয়া বারবার বিলম্বিত হয়, তাহলে সেই অসন্তোষ একসময় আন্দোলনে রূপ নেবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বারবার এই সত্য প্রমাণ করেছে। গণআন্দোলন হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। এটি তৈরি হয় দীর্ঘদিনের অসন্তোষ, বঞ্চনা এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকে। বর্তমান পরিস্থিতি সেই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ দেয় না। যদি সরকার সময়মতো সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়, যদি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে, তাহলে এই সংকট আরও গভীর হবে।

‘সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোট’-এর আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ

দেশের ১৩টি বামপন্থী, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ‘সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোট’-এর আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ওই জোটের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ‘অসম বাণিজ্য চুক্তি’ বাতিলের দাবি জানিয়ে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে জোটের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সিপিবির সভাপতি সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলন কেন্দ্রীয় পাঠচক্র ফোরামের সমন্বয়ক শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, বাসদ (মাহবুব) সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ ভূইয়া, গণমুক্তি ইউনিয়নের আহ্বায়ক নাসিরউদ্দীন নাসু, সোনার বাংলা পার্টির সভাপতি সৈয়দ হারুন অর রশীদ, জাতীয় গণফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক রজত হুদা, বাংলাদেশের সোশ্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম প্রমুখ।

অসম বাণিজ্য চুক্তি বাতিল ও ইরানে আগ্রাসনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

১১ এপ্রিল, ২০২৬ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত অসম বাণিজ্য চুক্তিসহ সকল জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তি বাতিল এবং ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলী হামলা, ফিলিস্তিনের গাজায় গণহত্যা, দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ‘সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ বিরোধী জোট’-এর বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হামে আক্রান্ত শিশুদের মৃত্যু উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে, সরকারের তৎপরতা অপ্রতুল, দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া দরকার

চলতি বছরে সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে হামে আক্রান্ত হয়ে অন্তত ৬৭৬ জন শিশু ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে অন্তত ৪১ জন। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে বাসদ (মার্কসবাদী) দলের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা এক বিবৃতিতে বলেন, “ঢাকা, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, শরিয়তপুর, নোয়াখালীসহ সারাদেশে বিভিন্ন জেলাগুলোতে আশঙ্কাজনক হারে এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ৩০ জন শিশু মৃত্যুবরণ করেছে। রাজধানী ঢাকার মহাখালীর সংক্রামকব্যাধি হাসপাতালে চলতি মাসের ২৯ দিনেই ভর্তি হয়েছে ৪৪৮ জন। যেখানে গত বছরজুড়ে ছিলো মাত্র ৬৯ জন। হাম খুবই সংক্রামক, যা দ্রুত ছড়িয়ে পরে। অতিদ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এই রোগ আরও ছড়িয়ে পড়বে, শিশুমৃত্যুও বাড়বে।”

তিনি আরও বলেন, “সংক্রমণ বাড়ছে কিন্তু হাসপাতালগুলোতে সরকারের তরফে তৎপরতা বাড়েনি। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ-এর অভাবে আক্রান্ত শিশুরা মারা গেছে। মহাখালীর সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল ১০০ শয্যার, যার মধ্যে হামের জন্য নির্ধারিত মাত্র ৮টি শয্যা। অথচ ২৯ মার্চ সেখানে রোগী ছিলো ১১৭ জন। হাসপাতালের মেঝেতেই আত্মীয়-পরিজনরা শিশুদের নিয়ে থাকছেন, চিকিৎসা নিচ্ছেন। অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়, গত কয়েক বছর ধরেই শিশুদের টিকা দেয়ার হার কমানো হচ্ছিল এবং ২০২৫ সালে এটি ৬০ শতাংশের নিচে নামে। ফলে লক্ষ লক্ষ শিশু টিকা সুরক্ষা পায়নি। সরকার সময়মত টিকা সংগ্রহ না করে লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবনকে হুমকির মধ্যে ফেলেছে। সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো: সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, সরকারি সংগ্রহে হামের টিকা নেই।” আমরা এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সরকারকে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানাচ্ছি।

কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবি কৃষক সংগঠনের

গত কয়েকদিন উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় কালবৈশাখী ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক আহসানুল আরেফিন তিতু ও সাধারণ সম্পাদক অজিত দাস এক বিবৃতিতে বলেন- 'গত কয়েকদিনে নীলফামারী, পঞ্চগড়, রংপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, মাগুরাসহ বিভিন্ন এলাকায় কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ধান, ভুট্টা, আলু, সবজিসহ বিভিন্ন ফসলের এবং গ্রামের বাড়িঘরের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিশেষত গত ২৭ মার্চ রাতে নীলফামারী জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড় ও শিলাবৃষ্টি স্মরণকালের ভয়াবহ ঘটনা। নীলফামারীর চারটি উপজেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কৃষক ঋণ করে সার, বীজ কিনে বহু পরিশ্রম করে এই ফসল ফলিয়েছে। আর কিছুদিন পরে তারা ফসল ঘরে তুলতো। কিন্তু এই ঝড়ে কৃষকের স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। নতুন করে এই ফসল লাগানোর সময়ও নেই। এ অবস্থায় সরকারের কৃষি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দ্রুত ফসলের ক্ষতিপূরণের জন্য নগদ টাকা,টিনসহ বাড়ি সংস্কারের অন্যান্য উপকরণ সরবরাহসহ পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া দরকার। প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে কৃষকদের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ফসলের ক্ষতিপূরণের জন্য স্থায়ী কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা দীর্ঘদিন ধরে ফসলের জন্য বীমা চালুর দাবি জানিয়ে আসছি। প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য শস্যবীমা চালুর ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ আশা করছি। এছাড়া দ্রুততার সাথে কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা করে তাদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের জোর দাবি জানাই।'

জয়পুরহাট সদর উপজেলায় বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের কমিটি গঠন

জয়পুরহাট সদর উপজেলার পুরানাপৈল ইউনিয়নের শার পুকুর পাড় গ্রামে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের গ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ২৫ মার্চ সন্ধ্যা ৭ টায় শার পুকুর পাড় গ্রামের কর্মীদের সভা জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য একরামুল হক। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মো: মোজাফফর হোসেনকে আহবায়ক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট গ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেনঃ- মো. সুলতান হোসেন, মো. আনোয়ার হোসেন, মো. শাহজাহান, মো. সৈয়দ আলী, মো. হাসান আলী, মো. সোলেমান মিয়া, মো. নাজিমউদ্দীন, মো. স্বপন মিয়া, মো. জাহাঙ্গীর আলম।

সদর উপজেলার পুরানাপৈল ইউনিয়নের গাংরাইল গ্রামেও সংগঠনের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট গ্রাম কমিটি গঠন করা হয়েছে। কালীচরণ তির্কী কে আহবায়ক ও বিমল টপ্পোকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত এ কমিটির অন্য সদস্যরা হলেনঃ– বিশ্বনাথ টপ্পো, গোপাল চন্দ্র মিঞ্জি, মঙ্গল উড়াও, সমরা উড়াও, ললিত চন্দ্র এক্কা, বিমতি কুজুর, মন্টু টপ্পো, রঞ্জিত তির্কী, সন্ধ্যা টপ্পো, সুনীল টপ্পো, শেফালী তির্কী, গীতা রানী, শিরিষ উড়াও।

সাম্যবাদ
১৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-২০২৬

যুদ্ধবিরোধী গান ও কবিতায় বাংলা নববর্ষ উদযাপন

১৪ এপ্রিল সকাল ১১ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিম চত্বরে যুদ্ধবিরোধী গান ও কবিতায় বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ যুব ফ্রন্ট ও কোরাসের উদ্যোগে এই আয়োজনটি হয়েছে। এতে গান পরিবেশন ও কবিতা আবৃত্তি করেন কবি মোহন রায়হান, দীপক সুমন, কবি সোয়েব মাহমুদ, মাভৈ গানের দল, হুমায়ূন আজম রেওয়াজ, ওয়ারদা আশরাফ, গৌরব ভৌমিক, শিহাব উদ্দিন। সুস্মিতা রায় সুপ্তি ও জয়মা মুনমুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ যুব ফ্রন্টের আহ্বায়ক রাশেদ শাহরিয়ার ও বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত।

অনুষ্ঠানে ইরান-ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন দেশে চলমান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। গান-কবিতা শেষে গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জে ছাত্র ফ্রন্ট এর ৭ দফা দাবীতে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

৬ই এপ্রিল ২০২৬, নারায়ণগঞ্জ শহিদ মিনারে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে "শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় ৭ দফা দাবি" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধন হয়। জেলা সাধারণ সম্পাদক দীপা নাগ তন্দ্রার সঞ্চালনায় এ কর্মসূচী উদ্বোধন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রগতি বর্মণ তমা। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক সাদেকুল ইসলাম সাদিক। বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সহ-সভাপতি নাদিরা ইসলাম রিয়া এবং সাংগঠনিক সম্পাদক সাদিয়া সুলতানা জুথি। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি জয় হাসান।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি কৃষি খাতের ধ্বংস ডেকে আনবে

গত ৯ ফেব্রুয়ারী অবিশ্বাস্য তড়িঘড়ি এবং গোপনীয়ভাবে সম্পাদিত আমেরিকা-বাংলাদেশ পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে। বিশেষত কৃষিখাত ধ্বংসের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন কৃষিপণ্য আমদানি করতে বাধ্য থাকবে। বাংলাদেশকে ৩.৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মার্কিন কৃষিপণ্য কিনতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে পাঁচ বছর ধরে প্রতিবছর অন্তত ৭ লাখ টন গম এবং অন্তত ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার বা ২৬ লাখ টন সয়া ও সয়াজাত পণ্য এবং তুলা। গম, তুলা, সয়াবিন সবকিছুই বর্তমানে অন্য দেশ থেকে আমদানি মূল্যের কয়েকগুণ বেশি দামে কিনতে হবে। এছাড়াও গরুর মাংস, দুধ জাতীয় বিভিন্ন পণ্য (পনির, দই, ঘি ইত্যাদি), হাঁস-মুরগী-ভেড়া ও পোল্ট্রিজাত বিভিন্ন পণ্য আমদানি করতে বাধ্য থাকবে। এভাবে আমদানির ফলে দেশের বিকাশমান পোল্ট্রি, ডেয়ারি শিল্প প্রচন্ড ক্ষতির সম্মুখীন হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মসংস্থান হারাবে। বেশি দামে খাদ্য পণ্য আমদানির ফলে দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বাড়বে। বিনাশুল্কে পর্যায়ক্রমে প্রায় ৪,৫০০ পণ্য আমদানি করতে হবে যার বেশিরভাগই কৃষিপণ্য। এর ফলে কৃষক, খামারী, ক্রেতা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

চুক্তির শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ কৃষিখাতে কোন ভর্তুকি দিতে পারবে না এবং যেসব খাতে ভর্তুকি দেয় সেগুলো আমেরিকার কাছে প্রকাশ করতে হবে। অথচ আমেরিকা নিজদেশে কৃষিখাতে ব্যাপক ভর্তুকি দেয়। তাদের পণ্য রপ্তানির জন্য আমাদের মত দেশগুলোতে কৃষি খাতে ভর্তুকি তুলে দেয়ার শর্তারোপ করে।

চুক্তিতে জিএমও (জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম) খাদ্য আমদানির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। জিএমও খাদ্য মানুষ, পরিবেশ, অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আরও ভয়ংকর বিষয় এধরনের পণ্যের মোড়কে এটা যে জিএমও তা উল্লেখ করা যাবে না।

কৃষিপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোন পুণঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাবে না। আমেরিকার বিভিন্ন মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন মেনে নিতে হবে।

চুক্তির এসকল শর্ত স্পষ্টত দেশের কৃষিখাতের জন্য অশনিসংকেত। এই চুক্তি বাস্তবায়ন হলে কৃষি উৎপাদন, কর্মসংস্থান, অর্থনীতি, ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়বে। ফলে অবিলম্বে এই চুক্তি বাতিল করতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার তড়িঘড়ি করে এই দেশবিরোধী চুক্তি করলেও নির্বাচিত বিএনপি সরকার তা বাতিল বা পর্যালোচনার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। এ পরিস্থিতিতে দেশের কৃষক, খামারী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, গবেষক, দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতাকে কৃষিখাত ধ্বংসকারী এই চুক্তি বাতিলের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

'নো কিংস' আন্দোলন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এ সব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে আইনের উর্ধ্বে একজন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা শুরু করেন। সামন্ত স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজারা যেমন নিজের ইচ্ছাকেই চূড়ান্ত ভাবত, ট্রাম্পও তাই করছেন। মার্কিন জনগণের এমন অনুভূতি থেকেই জন্ম নিয়েছে 'নো কিংস' আন্দোলন। ট্রাম্পকে 'স্বৈরাচারী রাজা' ঘোষণা দিয়ে 'নো কিংস' আন্দোলনের সূচনা। যার তৃতীয় ঢেউ চলমান। এই সমস্ত ঘটনাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে,মার্কিন শাসকগোষ্ঠী বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের ফেরি করে বেড়ালেও নিজদেশে গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরেছে। শাসন ব্যবস্থাকে ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত করছে। প্রচলিত আইন ও সংবিধানে যতটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত ছিল, সেটাও ছুড়ে ফেলছে, যা ফ্যাসিবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এবার ইরান আক্রমণের সময় প্রায় ৬০ শতাংশ মার্কিন জনগণ এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন। তারা যুদ্ধ চান না। মাত্র কয়েক মাস আগেই ফিলিস্তিনে মার্কিন-ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন। মার্কিন সেনা সদস্য অ্যারোন বুশনেল ফিলিস্তিনে ভয়াবহ গণহত্যা সহ্য করতে পারেননি। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সামনে নিজের শরীরে আগুন জ্বালিয়ে 'ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা চাই' স্লোগান দিতে দিতে আত্মাহুতি দেন। তাঁর এই আত্মহুতির পথ ধরে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে নেমে আসেন লক্ষ লক্ষ জনতা। আমেরিকাসহ গোটা বিশ্বে সে বিক্ষোভ স্পর্শ করে বিবেকবান মানুষকে। তার কয়েক বছর আগে আফগানিস্তানে যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখেছে মার্কিন জনগণ। যুদ্ধে আমেরিকা হত্যাযজ্ঞ চালায় এ সত্য। আবার এও সমান সত্য যে, মার্কিন অগ্রাসনের বিরুদ্ধে মাতৃভূমি রক্ষার পবিত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে প্রাণ হারান হাজার হাজার মার্কিন নাগরিক। যুদ্ধে যায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সেনা, আর সন্তান হারায় কোন এক নিরীহ মার্কিন মা। ইরাক, আফগানিস্তান, ইউক্রেন, ফিলিস্তিন, ইরান– এসব যুদ্ধে কত শত মার্কিন মায়ের সন্তান প্রাণ দিয়েছেন তার চিত্র খুব একটা সামনে আসে না। সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র দম্ভের নীচে চাপা পড়ে যায় কোন এক নিরিহ মায়ের কান্না, ভাই হারানোর ব্যথা। এর সাথে প্রাত্যহিক জীবনে যুদ্ধের ভয়াবহতা আরো বিশাল। যুদ্ধের ফলে আমেরিকার ধনকুবেররা ফুলে ফেঁপে আরো বড় হয়ে উঠে, কিন্তু তার প্রভাবে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, সামাজিক সুরক্ষা সংকুচিত হতে থাকে। যার চরম মূল্য দিতে হয় মার্কিন জনগণকে। এ জন্য এবার ইরান যুদ্ধে বেশিরভাগ মার্কিন জনগণের সায় ছিল না। জনগণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই ইরানে হামলা চালান ট্রাম্প।

এক রিপোর্টে দেখা গেছে যে, যুদ্ধের প্রথম ১০দিনে যে পরিমাণ খরচ হয়েছে, তা দিয়ে গৃহহীন প্রতিটি মার্কিন পরিবারহকে ৩০হাজার ডলারের সহযোগিতা করা যেত। কিন্তু এই বিপুল টাকা জনকল্যাণে নয়, যুদ্ধের মাত্র কয়েকদিনের খরচ। যুদ্ধের কিছু দিনের মাথায় আমেরিকায় গ্যাসে মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় ৩০শতাংশ। যুদ্ধ যত বাড়বে ততই এর হার বাড়তে থাকবে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (আইইএ) ঘোষণা করেছে, ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয়ায় বৈশ্বিক তেল সরবরাহ প্রক্রিয়ায় মারাত্মকভাবে বিঘ্ন ঘটছে, এমন বিঘ্ন পৃথিবী ইতিহাসে সর্ববৃহৎ। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির অনুমান, এর ফলে পৃথিবীতে প্রায় ৪৫ মিলিয়ন মানুষ নতুন করে তীব্র ক্ষুধার কবলে পড়বে। এ সকল কারণে মার্কিন জনগণ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে 'নো-কিংস' আন্দোলনে নেমে এসেছেন।

'নো কিংস' আন্দোলন কোন দলের নেতৃত্বে বা কোন বিশেষ মতাদর্শে ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি। বাম, প্রগতিশীল, যুদ্ধবিরোধী, ট্রাম্পবিরোধী নানা ঘরনার মানুষ ও সংগঠনের অংশগ্রহণে এ বিক্ষোভ সংগঠিত হচ্ছে। এ বিক্ষোভের বিশেষ কোন নেতা নেই। ট্রাম্প এ বিক্ষোভকে কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু এ বিক্ষোভ 'মূলত অহিংস' এবং স্বতঃস্ফূর্ত, যাতে লক্ষ লক্ষ জনগণ অংশ নিচ্ছেন।

'নো কিংস' আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে– এক, মার্কিন জনগণের চাওয়া আর শাসক গোষ্ঠীর চাওয়া এক ও অভিন্ন নয়। দুই, আমেরিকার মতো দেশেও আজ ফ্যাসিস্ট শাসন চলছে। তিন, ইরান যুদ্ধের বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণের লড়াই প্রমাণ করে এ ধরণের যুদ্ধকে 'ধর্মযুদ্ধ' বা 'ইসলাম বনাম ইহুদি-খ্রিস্টান' যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। চার, 'নো কিংস' আন্দোলনের চরিত্র মূলত স্বতঃস্ফূর্ত এবং সদিচ্ছা নির্ভর বিক্ষোভ। পাঁচ, বেশিরভাগ মার্কিন জনগণ বিষয়টিকে চিহ্নিত করছেন ট্রাম্পের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড হিসেবে। শ্রেণি প্রশ্নটি এখনও আন্দোলনে স্পষ্ট নয়। যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরণের বিরাট বিক্ষোভ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নিকট অতীতে এ ধরণের ঘটনা নজিরবিহীন। সবচেয়ে শক্তিশালী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের অভ্যন্তরে গড়ে উঠা লক্ষ লক্ষ লোকের এই আন্দোলন ব্যবস্থাটির করুণ অবস্থাকেই উন্মোচিত করে।

এসআইআর ইস্যু: নাগরিকদের অ-নাগরিক প্রমাণে মরিয়া ভারত রাষ্ট্র

আমাদের দেশের অনেক মানুষের মধ্যেই একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, ভারত রাষ্ট্র বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশে আগ্রাসন চালালেও তার দেশের মানুষকে সে ভালো রাখে। অর্থাৎ পরদেশ লুট করে হলেও নিজের দেশের নাগরিকদের ভালো রাখে, তাদের স্বার্থ রক্ষা করে। এ ধারণা যে কতবড় ভুল এবং সর্বনেশে আপনি বুঝতে পারবেন ভারতের সর্বশেষ এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) ইস্যুর ওপর নজর রাখলে। বাংলায় একে বলা হচ্ছে 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন'। অর্থাৎ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন। এর পুরো প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষন করে বলা যায়, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে এটি মূলত নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি সরকারের নিজেদের বানানো অনুপ্রবেশ তত্ত্বকে জোরালো করার চেষ্টা। বিহার, পশ্চিমবঙ্গসহ কয়েকটি রাজ্যে এটি সম্পন্ন হয়েছে, কতগুলোতে চলছে। ধীরে ধীরে অন্যান্য রাজ্যেও চলবে। বিজেপি সরকার বিশেষ করে টার্গেট করেছে সেই সমস্ত রাজ্যগুলোকে যেখানে তাদের সরকার নেই। পশ্চিমবঙ্গসহ বেশ কিছু রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। সেখানকার ভোটার তালিকাকে নিজেদের মত করে সাজিয়ে, বিরোধীদের বাদ দিয়ে, বিভক্তির পরিবেশ তৈরি করে রাজ্যগুলোর ফলাফল নিজেদের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আর এর গালভরা নাম দিয়েছে 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন'।

গত কয়েকবছর ধরেই বিজেপি সরকার অনুপ্রবেশ তত্ত্বকে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করছে। তারা বলার চেষ্টা করছে, বহু সংখ্যক লোক যারা ভারতে বাস করছে তারা ভারতীয় নন। বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আফগানিস্তান থেকে এসে বসতি গেড়েছে, সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। বিশেষ করে তাদের আঙুল বাংলাদেশের দিকে। আঙুল মুসলমানদের দিকেও উঠছে। বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে দিল্লি, হরিয়ানাসহ পশ্চিমবঙ্গের পাশ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে কর্মরত বাংলাভাষী শ্রমিক-নিম্নআয়ের মানুষদের বাংলাদেশী বলে চিহ্নিত করে নির্বিচারে গ্রেফতার করছে, জেলে ভরছে। তারা পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মানুষ হলেও রক্ষা পাচ্ছে না।

এদের মধ্যে অনেককেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে পাঠানো হয়েছে এবং হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে সন্দেহভাজনদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এমনকি নিজের দেশের আইনকেও ভারত সরকার অনুসরণ করেনি। এই পুরো প্রক্রিয়া কতটা অমানবিক এবং বর্বর তা বোঝার জন্য সোনালী বিবির ঘটনাই যথেষ্ট। সোনালী বিবি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার নাগরিক। কাজের সন্ধানে সে এবং তার পরিবার দিল্লিতে যায়। গতবছর জুন মাসে দিল্লি পুলিশ তাকে সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করে এবং জোরপূর্বক চাপাইনবাবগঞ্জের সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠায়। সোনালী বিবি সে সময় ৩৫ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তার সাথে ছিলো আট বয়সী ছেলে সন্তান। গ্রেফতার, ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা, বাংলাদেশে পাঠানো– পুরো সময়টা সোনালী বিবি কীভাবে অতিবাহিত করেছেন, কী খেয়েছেন, কোথায় থেকেছেন ভাবলে যেকোন সংবেদনশীল মানুষেরই গভীর বেদনা হবে। একজন নারীর গর্ভের সন্তান পর্যন্ত রাষ্ট্রের নিপীড়ন থেকে রেহাই পায়নি। মামলার একটা পর্যায়ে ভারতের আদালত স্বীকার করতে বাধ্য হলো, সোনালী বিবি ভারতের নাগরিক এবং ভারত রাষ্ট্র যেন তাকে ফেরত নেয়। সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে বলে,"আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে রাতের অন্ধকারে কাঁটাতারের ওপারে ঠেলে দেওয়া মানবাধিকারের চূড়ান্ত লঙ্ঘন।" এই রায়ের পরও বিজেপি সরকার গড়িমসি করেছে। একপর্যায়ে ভারত সরকার সোনালী বিবি ও তার সন্তানকে ফেরত নিতে বাধ্য হলেও বাকী ৪ জনকে ফেরত নেয়নি।

এসআইআর চালু করার কয়েকমাস আগে থেকেই অনুপ্রবেশ তত্ত্ব নিয়ে বিজেপি জোর প্রচারণা চালায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ বিভিন্ন মন্ত্রী এবং নেতা-কর্মীরা অনুপ্রবেশকারীদের ডিটেক্ট অর্থাৎ চিহ্নিত, ডিলিট অর্থাৎ বাদ, ডিপোর্ট অর্থাৎ দেশ থেকে বের করে দেওয়ার মত বিদ্বেষ ও বিভাজনমূলক বক্তব্য দেশব্যাপী দিতে থাকেন। তাদের দাবি, ভারতবর্ষে ২ কোটি 'ঘুসপেটিয়া' অর্থাৎ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী আছে। সর্বশেষ বিহারে যে এসআইআর হলো, সেখানে ৪৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। সেখানে মাত্র ৩৭০ জনের মত 'বাংলাদেশী'র নাম পাওয়া গেছে। যাদের বেশিরভাগই 'হিন্দু'। ফলে অবৈধ মুসলিম বাংলাদেশী বসবাসের যে দাবি বিজেপি করে তা ধোপে টেকে কি? ভারত সরকারের এসব দাবির প্রেক্ষিতে বিগত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর তরফে যখন ভারত সরকারের কাছে বহিরাগতদের তালিকা চাওয়া হয় এবং তাদের ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে জানানো হয় তখন ভারত সরকার টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি। বাস্তবে বিজেপি সরকার জানে, তাদের দাবির বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। এসব হলো ভোটের মাঠ দখলে রাখার বুর্জোয়া কৌশল মাত্র।

ভারতের নির্বাচন কমিশন ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের বৈধ এবং এরপরে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের সবাইকে সন্দেহের তালিকায় রেখেছে। এইভাবে ভাগ করাটা ব্যাখাহীন এবং স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের পরিচায়ক। এছাড়াও কমিশন নাগরিকত্ব যাচাইয়ের জন্য ১৩টি নথিকে প্রামান্য হিসেবে ধরেছে। যারা বস্তিতে থাকেন, দরিদ্র এবং যাদের স্থায়ী ঘর-বাড়ি নেই এসমস্ত মানুষ গভীর সংকটে পড়েছেন। কোথা থেকে তারা নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া কাগজপত্র জোগাড় করবেন? ২০০২ সালেও ৮ মাস ধরে নিবিড় সংশোধনের কাজ চলেছে। এর আগে বা পরেও ভোটার তালিকার কাজ চলেছে। সেসবে মৃত ভোটারদের নাম বাদ গেছে এবং নতুনদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু এবারের মত জীবিত ভোটারদের নাম ফরম পূরণ করে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়নি। যারা অন্য রাজ্যে কাজ করেন, গরীব মানুষ, তারা গাড়ি ভাড়া দিয়ে কীভাবে নিজ রাজ্যে ফিরবেন তা নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় আছেন। যারা দিনমজুর তারা কাজ বাদ দিয়ে ঘরে বসে থাকছেন– কমিশন থেকে কর্তাব্যক্তিরা এসে তাকে যদি না পায়, যদি নাম বাদ পড়ে যায়। কমিশনের পক্ষে যারা তথ্য সংগ্রহ করছেন (BLO) তারাও অসহনীয় চাপ নিয়ে কাজ করছেন। তাদের মধ্যেও চাপ নিতে না পেরে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।

বিভিন্ন রাজ্যে নাগরিকদের পক্ষে অসংখ্য অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বিজেপি ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দল, নাগরিক সংগঠন, ব্যক্তিবর্গ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। এর বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক মামলা দায়ের হয়েছে। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোটারদের নাম নিবন্ধনে বাধা দেওয়া হয়েছে। অবৈধ হিসেবে অভিহিত করে তাদের বস্তিগুলো পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয়েছে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ সহ বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক কৃষি শ্রমিক কাজের প্রয়োজনে অন্য রাজ্যে থাকায় বাড়িতে অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে ভোটার তালিকায় তাদের নাম ওঠেনি। ছত্রিশগড়ে নানা সহিংসতায় বহু গ্রামের মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। সেখানে এক লক্ষের অধিক মানুষ বাদ পড়ার আশঙ্কায় আছেন। বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, উচ্চবিত্ত এলাকায় অধিকাংশ মানুষ ভোটার হতে পারলেও নিম্নবিত্ত এলাকায় এ সংখ্যা কম। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের ৬৩ লক্ষ মানুষকে বিবেচনাধীন বলে চিহ্নিত করে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলা হয়েছে। খসড়া তালিকা থেকে পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষের নাম বাদ দেয়া হয়েছে তাদের একটা বড় অংশই বৈধ ভোটার। মতুয়া জনগোষ্ঠীর লোকজনও নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। ভোটে জেতার লোভে বিজেপি সরকার একদিকে যেমন নাগরিকদের চরম দূরবস্থায় ফেললো, একই সাথে সংসদীয় ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ভোটব্যবস্থাকে কালিমালিপ্ত করলো।

জনগনকে হেনস্তার মূলে রয়েছে বিজেপির বুর্জোয়া ভোট পলিটিক্স। এরই অংশ হিসেবে মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। এরমানে এটা নয়, তারা সাধারণ হিন্দু জনগণের স্বার্থ রক্ষা করছে। এর মূল লক্ষ্য হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটকে ধর্মীয় মেরুকরণ করে বিজেপির দিকে টেনে আনা। আর এই অভিসন্ধিই হলো বিজেপির অনুপ্রবেশ তত্ত্বের ভেতরের কথা। ভারতের হিন্দু-মুসলিমসহ সকল নাগরিক বিজেপি-আরএসএসের সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির শিকার। এরসাথে সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী হিন্দু জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। বরং তাদের অনেকেই মোদীর নোংরা সাম্প্রদায়িক উস্কানির বিরুদ্ধে লড়ছেন। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন বুর্জোয়া দল বিজেপি সরকারের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নাম করে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিচ্ছে। ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা যেমন বাংলাদেশে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দেয়, একইভাবে বাংলাদেশে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দেয়। তাই দুই দেশের গণতান্ত্রিককামী-অসাম্প্রদায়িক মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে, বিজেপি-আরএসএস গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে লড়াইটা এমনভাবে হতে পারে না যাতে সাম্প্রদায়িকতাই উস্কানি পায়। লড়াই করতে হবে, অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক চিন্তাকে ভিত্তি করে।

নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এক একটি নির্যাতনের বিভৎসতা- নৃশংসতা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আরেকটিকে। বিচারহীনতার কারণে বাড়ছে ধর্ষণ-নির্যাতন।

কারণ অন্যায় প্রশ্রয় পেলে, এর বিচার না হলে অন্যায়কারীরা উদ্ধত হয়, বেপরোয়া হয়। অপরদিকে সাধারণ মানুষ, যারা অন্যায়ের শিকার হন; তাদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ে, ক্ষোভ বাড়ে, সেটা প্রতিবাদের রূপ না পেলে সমাজে নেমে আসে হতাশা এবং মেনে নেয়ার সংস্কৃতি। অন্যায়ই তখন নিয়ম হয়, বিচার ও শাস্তি হয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

যেকোনো অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে আইনের প্রয়োগ জরুরি। কিন্তু দেশের আইনে ধর্ষণ ফৌজদারি অপরাধ হলেও এটি প্রায় অকার্যকর। এর প্রয়োগ বা বিচার নেই বললেই চলে। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুধু নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই বছরের জানুয়ারিতে ৩১টি পারিবারিক সহিংসতা, ৩৫টি ধর্ষণ, ২টি যৌন হেনস্তা এবং ৬টি বাল্য বিবাহ ও দাম্পত্যবিষয়ক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নারীকে অসম্মান, চরিত্রহনন এবং সংঘবদ্ধ সহিংসতার ঘটনা নিয়মিত উদ্বেগের কারণ। যেখানে প্রায়শই রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে নারীর পোশাক ও ব্যক্তিগত জীবনকে 'টুল' হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

গণপরিবহনে যৌন সহিংসতার ঘটনা নারীকে নিয়মিত মোকাবেলা করতে হয়। সম্প্রতি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও ইউএন উইমেনের যৌথ জরিপে প্রকাশিত হয়েছে যে, দেশের প্রায় ৮৭ শতাংশ নারী কোনো না কোনোভাবে গণপরিবহনে হয়রানির শিকার হন। দিনের পর দিন নারী ও শিশু নিপীড়নের ভয়াবহ চিত্র দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণ-পরবর্তী হত্যা, পারিবারিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি, বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতনের হার বেড়েছে আশঙ্কাজনকভাবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারীরা সামনের সারিতে থেকে লড়াই করেছে। আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের আন্দোলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অথচ গণ-অভ্যুত্থানের পর পরই নারীদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। নারীদের ভূমিকা আড়াল করা হয়েছে। নারী সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিরোধিতা ও সরকারের নতজানু মনোভাবের কারণে তা আলোর মুখ দেখেনি। শুধু তা-ই নয়, কমিশনের সদস্যদের নানাভাবে অসম্মান ও অপমান করা হয়েছে। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর আলোচনা জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল। দলীয় মনোনয়নে ৩০ শতাংশ নারী প্রার্থী অথবা সংরক্ষিত নারী আসন ১০০ তে উন্নীত করে সরাসরি নির্বাচনের দাবি ছিল। শেষ পর্যন্ত কয়েকটি দলের বিরোধিতায় তা বাস্তবায়িত হয় নি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বর্তমান ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের কেউই সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নি।

নির্বাচনের সময় জামায়াতের আমির নারীদের নিয়ে অপমানসূচক বক্তব্য রেখেছেন। বরিশালে নারী প্রার্থীকে টকশো থেকে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে ইসলামি আন্দোলনের পীরের আপত্তির কারণে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ নানা মাধ্যমে নারীকে ধারাবাহিকভাবে সাইবার বুলিং করা হয়েছে। এসব ঘটনায় সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। এদেশে প্রায় ৫১ শতাংশ নারী হওয়ার পরও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নারীকে নিকৃষ্ট হিসাবে দেখাতে চায়। নারীর উপর ঘটে যাওয়া নিপীড়নগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বেশিরভাগ ঘটনায় অপরাধীরা ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।" লিখিত বক্তব্য শেষে ১৪ দফা দাবি নামা তুলে ধরা হয়।

সাম্যবাদ
১৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-২০২৬

ইরান যুদ্ধ ও প্রবাসী শ্রমিক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

২.

এখন পর্যন্ত চলমান যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে আটজন বাংলাদেশি নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। কারও স্বামী, কারও বাবা,কারও কন্যা। সর্বশেষ লেবাননে ইসরায়েলের হামলায় নিহত হয়েছেন ফরিদপুরের নারী শ্রমিক দিপালী বেগম। দিনমজুর বাবা ও পাঁচ ভাইবোনের অভাবের সংসারের হাল ধরার জন্য ২০১১ সালে জীবিকার তাগিদে লেবাননে যান দিপালী। তখন তাঁর বয়স ১৯ বছর। তাঁর পাঠানো টাকায় তার বাড়িতে দুটি ভাঙা ছাপরা থেকে দুটি চারচালা টিনের ঘর তৈরি হয়। একে একে সব ভাই-বোনের বিয়ে দিলেও নিজে বিয়ে করেননি। ২০২৪ সালের এপ্রিলের পর আর দেশে ফেরা হয়নি তাঁর। "ওরে আপা, আপা রে, চিরকাল সংসারের ঘানিই টাইনা গেলি, নিজের কথা একবারের জন্যও ভাবলি না'– দিপালীর মৃত্যুসংবাদ জানার পর কাঁদতে কাঁদতে সাংবাদিকদের একনাগাড়ে কথাগুলো বলছিলেন দিপালী বেগমের ছোট বোন লাইজু বেগম। (প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল, ২০২৬)

মৌলভীবাজারের সালেহ আহমেদ আরব আমিরাতের আজমানে পানি সরবরাহকারী গাড়ির চালক হিসেবে ৩০ বছর ধরে কাজ করছিলেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ এসে পড়ে তার গাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয় তার। সম্প্রতি তিনি তার গ্রামের বাড়িতে বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। সালেহ আহমেদের পুত্র আব্দুল হক বলেন,"সেই স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে তার মৃত্যুতে।" স্ত্রী মিনু বেগম সাংবাদিকদের বলেন, "আমার স্বামী ছিল আমার সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। এই যুদ্ধ আমার জীবন থেকে সব কেড়ে নিয়েছে।" তার এক সন্তান থ্যালাসেমিয়ায় ভুগছে, যার মাসে অন্তত একবার রক্ত দেয়ার প্রয়োজন হয়। এখন উপায় কী হবে, ভেবেই পাচ্ছেন না অসহায় মা।

ফুজাইরার দিব্বা এলাকায়একটি ফার্মহাউসের বাগানের কাজ করার সময় ইরানি ড্রোনের ধ্বংসাবশেষে আহত হন কুমিল্লার মোহাম্মদ শাহ আলম। ১লা এপ্রিল মৃত্যু হয় তার। সৌদি আরবের আল-খারজ এলাকায় একটি শ্রমিক ক্যাম্পে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত হন কিশোরগঞ্জের বাচ্চু মিয়া,টাঙ্গাইলের মোশাররফ হোসেন ও ময়মনসিংহের আবদুল্লাহ আল মামুন। চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের মোহাম্মদ তারেক নিহত হন বাহরাইনে। প্রতিটি মৃত্যুর সঙ্গে ভেঙে যায় একটি পরিবার, অন্ধকারে ডুবে যায় একটি ভবিষ্যৎ।

৩.

যুদ্ধ কেবল প্রাণহানিই ঘটাচ্ছে না, ধ্বংস করছে কর্মসংস্থানও। প্রবাসী নূর নবী জানান, পণ্য পরিবহন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সৌদি আরবসহ ছয় উপসাগরীয় দেশে ব্যবসা করা অনেক প্রতিষ্ঠান কর্মী ছাঁটাই করছে বা বেতন অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছেন চুক্তিবিহীন বা দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করা শ্রমিকরা। দুবাইয়ের দিনমজুর মামুনুর রশিদ জানান, যুদ্ধের পর থেকে কাজ পাওয়া প্রায় বন্ধ। আকামা (ওয়ার্ক পারমিট) করার টাকাও তার নেই, ফলে অবৈধ হওয়ার পাশাপাশি অনাহারে দিন কাটানোর শঙ্কা তৈরি হয়েছে। সৌদি আরবের জেদ্দায় কর্মরত সাইফুল ইসলাম জানান, এই সংঘাত তার রুজি-রোজগার শেষ করে দিয়েছে। আগে চালক হিসেবে মাসে ৮০-৯০ হাজার টাকা দেশে পাঠাতে পারলেও এখন রেস্তোরাঁয় কাজ করে মাত্র ৩০ হাজার টাকা পাঠাতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে। তার মাথায় প্রায় ৮ লাখ টাকা ঋণ। সৌদি আরবের আরেক প্রবাসী নাসির উদ্দিন জানান, যুদ্ধের প্রভাবে তার কাজ প্রায় বন্ধ। তার থাকার জায়গার মাত্র ১০ মিনিট দূরত্বের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজন মারা গেছেন। আগে মাসে ৫০ হাজার টাকা পাঠাতে পারলেও এখন নিজের থাকা-খাওয়ার খরচ চালানোই কঠিন। আরব আমিরাতের একটি সাইনবোর্ড কোম্পানির কর্মী সাইফুল ইসলাম জানান, যুদ্ধের অজুহাতে তার কোম্পানি মার্চ মাসের অর্ধেক বেতন পরিশোধ করেছে এবং তাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০ প্রকল্পের অধীনে নতুন নিয়োগ স্থগিত হয়ে যেতে পারে। ইতোমধ্যে নির্মাণ ও সেবা খাতে ১০-২০ শতাংশ ওভারটাইম সুযোগ কমেছে এবং বেতন পরিশোধে ২ থেকে ৬ সপ্তাহ বিলম্ব হচ্ছে।

৪.

ইরান, ইরাক, কুয়েত, কাতারসহ উপসাগরীয় দেশগুলো আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়ায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গালফগামী প্রায় ৮০০টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৫৫ থেকে ৬৫ হাজার যাত্রী (যাদের অধিকাংশই প্রবাসী শ্রমিক) দেশে বা গন্তব্যে আটকা পড়েছেন। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের সবচেয়ে বড় আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের ভিসার মেয়াদ এবং কাজের চুক্তি। যারা বর্তমানে ছুটিতে দেশে এসেছেন, তারা পড়েছেন সবচেয়ে বড় বিপদে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর নিয়ম অনুযায়ী, গৃহকর্মীদের (খাদিম ভিসা) চার মাসের মধ্যে এবং সাধারণ খাতের কর্মীদের (শোন ভিসা) ছয় মাসের মধ্যে ছুটি শেষে নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরতে হয়। কিন্তু ফ্লাইট সংকট, বর্ধিত বিমান ভাড়া এবং যুদ্ধাবস্থার কারণে অনেকেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরতে পারছেন না। ফলে তাঁদের এখন মৃত্যুভয় ছাপিয়ে কাজ হারানোর ভয় বড় হয়ে উঠেছে। আবার উড়োজাহাজের টিকিটের দাম আকাশচুম্বী হয়ে পড়ায় অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত অনেক শ্রমিক ইচ্ছে থাকলেও দেশে ফিরতে পারছেন না। তাঁদের দিন কাটছে মৃত্যুভয়ে।

৫.

প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুভয় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে প্রবাসীদের। সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মরত মামুনুর রশিদ জানান, "ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন আকাশসীমায় প্রবেশ করলেই মোবাইলে সাইরেন বেজে ওঠে। প্রতিনিয়ত আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়।" কাতারের অ্যালুমিনিয়াম সেক্টরে কাজ করা ইয়াসিন হামিদ বলেন, "রাস্তায় বের হলে মনে হয় এই বুঝি জীবনটা শেষ হয়ে গেল।" প্রবাসী নূর নবী জানান, যুদ্ধের কোনো ভিডিও বা তথ্য সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করলে গ্রেপ্তার ও জরিমানার শিকার হতে হয়। ভয়ে অনেকে ফোনে কথাবার্তা বা ছবি তোলা বন্ধ করে দিয়েছেন। সৌদি প্রবাসী মেহেদী হাসান জানান দেশে ফিরতে চাইলেও ঋণের বোঝা ও অসুস্থ বাবার চিকিৎসার খরচ তাকে আটকে রেখেছে। তিনি বলেন,"চাকরি ছেড়ে দেওয়া মানে পরিবারের জন্য আর্থিক মৃত্যুদণ্ড।" তার স্ত্রী তাহমিনা করিম বলেন, "আমরা প্রতিটি মুহূর্ত আতঙ্কে থাকি। কিন্তু দেশে আমাদের বেঁচে থাকার কোনো অবলম্বন নেই।"জাগো নিউজ টোয়েন্টিফোর, ৭ এপ্রিল, ২০২৬)

৬.

মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত ৭০ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি ও তাঁদের পরিবার এখন প্রতিটা দিন কাটাচ্ছেন প্রচণ্ড আতঙ্ক, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তায়। বাংলাদেশ সরকার নিহত প্রবাসীদের লাশ দেশে ফিরিয়ে আনা, দাফনের খরচ দেওয়া এবং আর্থিক সহযেগিতা দিচ্ছে।ফেরত আসা প্রবাসী শ্রমিকদের পুনর্বাসন,কর্মসংস্থান করা হবে বলা হলেও,এখন পর্যন্ত তা কথাতেই সীমাবদ্ধ আছে। অথচ করার আছে অনেক কিছুই। কারণ এটা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। যারা অমানুষিক পরিশ্রম করে,পরিবার-পরিজন ছেড়ে থেকে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতি টিকিয়ে রেখেছেন– বিনিময়ে দেশ তাঁদের জন্য কি করছে? এ প্রশ্নটা আসাই স্বাভাবিক। যারা দেশে ফিরতে চান,তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া,ফ্লাইট বন্ধ হওয়ায় যারা ছুটিতে এসে দেশে আটকা পড়েছে বা নতুন কাজে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও যেতে পারছেন না– তাঁদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর ব্যবস্থা করা এ মূহুর্তের জরুরী করণীয়।যারা ছাঁটাই হয়েছে বা মজুরি কর্তনের শিকার হয়েছে– সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার ও কোম্পানির সাথে কথা বলে আইনী সুরক্ষা ও পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা করা দরকার। যারা কাজ হারিয়ে দেশে ফিরেছেন,তাঁদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে ফিলিপাইনের উদ্যোগ শিক্ষণীয় হতে পারে। দেশটি ইতোমধ্যে ২৯৯ জন প্রবাসীকে দুবাই থেকে ম্যানিলায় ফিরিয়ে এনেছে। প্রেসিডেন্টের নির্দেশে প্রত্যেক প্রত্যাবাসিত কর্মীকে আর্থিক সহায়তা, থাকার জায়গা, চিকিৎসা ও মনোসামাজিক কাউন্সিলিং প্রদান করা হচ্ছে।

৭.

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় দুর্বলতা উন্মোচিত করেছে। তৈরি পোশাক শিল্পের পর রেমিট্যান্সই দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মূল ভরসা। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা চরম হুমকির মুখে পড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন। ২০২৫ সালে বাংলাদেশ রেকর্ড ৩২.৮ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আয় করেছিল, যার ৪৫ শতাংশের বেশি (প্রায় ১৩.৫ বিলিয়ন ডলার) এসেছে শুধু মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি উপসাগরীয় দেশ থেকে। একক দেশ হিসেবে সৌদি আরব থেকেই ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসেছে ৬.৫ বিলিয়ন ডলার। মোট প্রবাসী শ্রমিকের ৭৫ শতাংশের কর্মস্থল এই মধ্যপ্রাচ্য।এই নির্ভরতার বড় মূল্য এখন দিতে হচ্ছে। অর্থনীতির ভাষায় একে বলে 'সিঙ্গল পয়েন্ট ফেইলিওর রিস্ক'– একটি ঘটনা গোটা ব্যবস্থাকে ধসিয়ে দিতে পারে। বিশেষজ্ঞরা এই সংকটকে বাংলাদেশের জন্য 'মেজর শক' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। শ্রমবাজারের এই একক নির্ভরশীলতা (শুধু সৌদি আরবের ওপর ৬৭ শতাংশ নির্ভরতা) অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর প্রতিনিধিরা বলছেন – ইউরোপ, জাপান, ল্যাটিন আমেরিকার মতো বিকল্প বাজার কাজে লাগাতে ব্যর্থ হওয়ার ফল এখন ভুগতে হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের সংকট ও বৈধ পথে যাওয়ার ইউরোপ যাওয়ার সুযোগ কম থাকায় – অবৈধ পথে দালালদের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টার প্রবণতা বেড়েছে। গত মার্চ মাসের শেষে লিবিয়ার 'গেম ঘর' থেকে নৌকায় চড়ে সাগর পাড়ি দিয়ে গ্রিসে যাওয়ার পথে অন্তত ১৮ জন বাংলাদেশি মারা গেছেন।

৮.

এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো কেন? কেন দেশের লক্ষ লক্ষ যুবককে কাজের খোঁজে বাইরে যেতে হয়? দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না কেন? এর কারণের দিকে কেউই আঙুল তুলেন না। সরকার যেভাবে উন্নয়নের ফিরিস্তি দেন, তাতে তো দেশেই নতুন কর্মসংস্থানের বন্যা বয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেটা হয় না। বাস্তবে দেশে শিল্পকারখানা বাড়ছে না, বরং একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিল্পায়ন হতে পারে তখনই, যখন উৎপাদিত পণ্যের বাজার থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার নিজস্ব নিয়মেই সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে এবং বাজার সংকট সৃষ্টি হয়। ফলে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক চাকরির বাজারে প্রবেশ করে, কিন্তু সে পরিমাণ চাকরি থাকে না। তাই আজ পুঁজিবাদী সকল দেশেই বিপুল সংখ্যক মানুষ বেকার। সস্তা শ্রমিক হিসেবে আমাদের মতো দেশগুলো থেকে দলে দলে আসা শ্রমিকদের তারা নিয়োগ দেয়, মুনাফা বৃদ্ধি করে। এদের শ্রমের মূল্যই শুধু কম নয়, এদের জীবনের দামও কম। ফলে সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে তাদের মৃত্যু হয়, অমানবিক পরিশ্রম করতে গিয়ে তাদের মৃত্যু হয়। প্রতিবছর প্রায় ৫ হাজার প্রবাসী শ্রমিকের লাশ দেশে আসে। এর কোন তদন্ত হয় না।

প্রবাসে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করার দিকে সরকার কোন নজর দেয় না, ব্যাপারটা শুধু তাই নয়। প্রবাসে কর্মক্ষেত্রটা সৌদিনির্ভর। নতুন কোন কর্মক্ষেত্রের খোঁজ করা ও ওইসকল দেশের সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রবাসের কর্মক্ষেত্রকে বিস্তৃত করার কোন উদ্যোগও তারা নেয়নি। গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানী ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের উপরই দেশের ডলারের রিজার্ভ নির্ভর করে। অথচ প্রবাসী শ্রমিকদের মতো গার্মেন্টস শ্রমিকরাও সবচেয়ে বেশি শোষিত হয়।

সাম্যবাদ

১৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-২০২৬

সাম্যবাদ-এর ফেসবুক পেইজ ফলো করতে স্ক্যান করুন

‘নো কিংস’ আন্দোলন

আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ: ক্ষমতায় গিয়ে সবাই রাজা

সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মতন জনবিক্ষোভ আছড়ে পড়ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। লক্ষ লক্ষ জনতার ‘নো কিংস’ ধ্বনিতে মার্কিন মুলুক কাঁপছে। গণতন্ত্রের ভেকধরা ট্রাম্প প্রশাসনের মুখোশ খুলে দিয়েছে সে দেশের জনগণ। ট্রাম্পকে ‘রাজা’র মতো স্বেচ্ছাচারী ঘোষণা করে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই স্লোগান উঠছে– ‘আমাদের কোন রাজা নেই!’

নিজ দেশের জনমত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যুদ্ধবাজদের শিরোমনি ট্রাম্প ইরানে হামলা করছে। মার্কিন বোমায় পুড়ছে ইরানের মানুষের স্বপ্ন, সুখ। যুদ্ধের আগুনে ইরান পুড়েছে এ সত্য, কিন্তু সাথে সাথে এও সত্য যে যুদ্ধের ভয়াবহতায় বিপর্যস্ত মার্কিন জনগণের জীবনও। ইতোমধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ নানা কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ বিক্ষুব্ধ। যুদ্ধের ব্যয় বাড়ছে, অথচ ফেডারেল সরকার চিকিৎসাসহ জনজীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যয় কমিয়ে দিয়েছে। ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, এসব খাতে বরাদ্দ দেয়ার দায়িত্ব তার না, রাজ্য সরকারের। ফেডারেল সরকার শুধু দেশের নিরাপত্তার বিষয়টি দেখবে। ফলে ইরানের সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্রও পুড়ছে। পুড়ছে অনেকদিন ধরে। সাধারণ মানুষের উপর কর বৃদ্ধি করা হয়েছে, অপরদিকে কর্পোরেটদের কর কমানো হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে। কর নীতি ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোকে বছরে ৯০০ ডলার অতিরিক্ত খরচের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

ট্রাম্প তার Immigration and Custom Egency-কে ব্যবহার করে অভিবাসীদের ‘মাস ডিপোর্টেশন’ বা ‘গণবিতাড়ন’ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এ বছরের জানুয়ারি মাসে এই এজেন্সি মিনোপলিসে গুলি করে দুইজনকে হত্যা করে। এই ঘটনা গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে তীব্র আলোড়ন তুলে। ২০২৫ সালে ICE-এর হেফাজতে প্রায় ৩৩ জন মারা গেছেন, যা গত ২০ বছরের মধ্যে রেকর্ড। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফিলিস্তিনে গণহত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ভয়াবহ নিপীড়ন চালায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের গণহারে গ্রেফতার করা হয়। ফলে যুক্তরাষ্ট্র উত্তপ্ত হয়েই ছিল। অস্ত্র ব্যবসায়ী, তেল ব্যবসায়ী আর বড় বড় কর্পোরেটদের স্বার্থরক্ষার জন্য গোটা দুনিয়াকে ছারখার করে দেয়া রাষ্ট্রনেতার ক্রমাগত ভুয়া হুঙ্কার দেশের মানুষ আর নিতে পারছিলেন না। এর পরিণতি এই ‘নো কিংস’ আন্দোলন।

আমরা আজকে যখন এই লেখা লিখছি, তখন ইরান যুদ্ধে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে।মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন, ইরান যদি তার শর্ত না মানে তাহলে গোটা ইরানি সভ্যতাকে (পারস্য) ইতিহাস থেকে মুছে দেবেন। ইরান সে শর্ত মানেনি, বরং ট্রাম্পের এই ভয়াবহ ঘোষণার পর ইরানের জনগণ রাজপথে নেমে এসেছেন। ইরানি জনতার অকুতোভয় প্রতিরোধ, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ আর মার্কিন জনগণের চাপে ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছেন। এই যুদ্ধবিরতি বাস্তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এক ধরণের পশ্চাদপসরন। এই পশ্চাদপসরনের ক্ষেত্রে ইরানি জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা স্মরণ করেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ‘নো কিংস’ আন্দোলনের বিরাট প্রভাবও এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

মূলতঃ ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর ‘নো কিংস’ আন্দোলন শুরু হয়। ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে মার্কিন সংবিধানের কোন তোয়াক্কা না করেই নিজের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা শুরু করেন। নির্বাহী আদেশে তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের ক্ষমতা কমানো ও নিজের ইচ্ছা মতন আমূল পরিবর্তন, রাজ্যপালের আপত্তি সত্ত্বেও শহরে সেনা মোতায়ন করেন। শুধু তাই নয়, নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন, বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার, বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ, Make America great again-স্লোগান দিয়ে কঠোর অভিবাসী দমন নীতি– ● এরপর ৫ম পৃষ্ঠায়

ইরান যুদ্ধ ও প্রবাসী শ্রমিক:

সহযোগিতা ও সম্বলবিহীন নিঃসঙ্গ লড়াই রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের

১.

‘কয়েক মিনিট পরপর মিসাইলের শব্দ শোনা যায়। ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। মনে হয় যেকোনো মুহূর্তে জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে।’

দুবাইয়ে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিক নাসির এভাবেই যুদ্ধের মধ্যে তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন।একটি চীনা কোম্পানিতে কর্মরত নাসির আরব আমিরাতের দুবাইয়ে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির কাছেই একটি লেবার ক্যাম্পে থাকেন।নাসিরের পরিবার প্রতিনিয়ত আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। তিনি দেশে ফিরতে চান। কিন্তু ফিরলে চাকরি, ভিসা এবং আয়ের একমাত্র উৎস হারাবেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে প্রবাসে পড়ে আছেন বলে জানান তিনি। (দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-২৩ মার্চ, ২০২৬)

এ চিত্রটা ইরানের সাথে আমেরিকা-ইসরাইলের যুদ্ধের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতি। সম্প্রতি ইরানের উপর আমেরিকা-ইসরাইলের হামলা এবং মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে ইরানের পাল্টা হামলার ফলে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন পরিশ্রমী শ্রমজীবী মানুষ–যাদের ঘামের বিনিময়ে চলে গোটা আরব দেশগুলোর অর্থনীতি। উপসাগরীয় অঞ্চলে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই অভিবাসী। সৌদি জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বিদেশি, আর সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতারে এই অনুপাত ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশের দেড় কোটির বেশি শ্রমিক বিদেশে কর্মরত। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি দেশেই কর্মরত ৭০ লক্ষেরও বেশি। সাম্প্রতিক যুদ্ধে তাদের জীবন-জীবিকা ভয়াবহ সংকটে পড়েছে। ● এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

নির্বাচন ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নানা আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বানে বাসদ (মার্কসবাদী) দলের ১০ জন নারী সংসদ সদস্য প্রার্থীর সংবাদ সম্মেলন গত ৫ মার্চ ঢাকা রিপোটার্স ইউনিটির সাগর-রুনি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন আসমা আক্তার (চট্টগ্রাম-১০), তসলিমা আক্তার বিউটি (গাজীপুর -১), দীপা মজুমদার (চট্টগ্রাম -১১), রাহেলা খাতুন (গাইবান্ধা-৫), তৌফিকা দেওয়ান লিজা (জয়পুরহাট -১), প্রগতি বর্মণ তমা (রংপুর-৪), সাদিয়া নোশিন তাসনিম চৌধুরী (মৌলভীবাজার-২), মুনতাহার প্রীতি (নোয়াখালী-৫), শাহিনুর আক্তার সুমি (ঢাকা-৫)। সভায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঢাকা - ৭ আসনের প্রার্থী কমরেড সীমা দত্ত।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, “দেশে একের পর এক ঘটে যাওয়া নারী ও শিশু নির্যাতনের ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে আজ আমরা অত্যন্ত উদ্বেগ ও ক্ষোভের সঙ্গে আপনাদের সামনে কিছু কথা বলতে উপস্থিত হয়েছি। সীতাকুণ্ডের ইরামনি, নরসিংদীর আমেনা, ঝিনাইদহের তাবাসসুম, পাবনা- ঈশ্বরদীর জামিলা, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আসমা সাদিয়া রুনাসহ সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া ধর্ষণ-গণধর্ষণ-হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো সমাজের সর্বস্তরের বিবেকবান মানুষের হৃদয়কে কাঁপিয়ে দিয়েছে। এই সমাজ-রাষ্ট্র-মানুষকে ধীরে ধীরে এক অন্ধকার গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছে দেশের শাসকরা। ঘরে-বাইরে-কর্মক্ষেত্রে-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনকি ধর্মীয় উপাসনালয়ে-কোথাও নারীর নিরাপত্তা নেই, মর্যাদা নেই। ধর্ষণ-নির্যাতনের সব খবর আসে না পত্রিকায়। দু’একটি ঘটনায় আলোড়ন উঠে-আবার হারিয়ে যায়। দিন দিন ঘটনার ব্যাপকতা, মাত্রা, বিভৎসতা ভয়াবহ মাত্রায় বাড়ছে! ● এরপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

ইরানে আগ্রাসনের প্রতিবাদে সমাবেশ

১০ এপ্রিল, ২০২৬ জাতীয় জাদুঘরের সামনে,ইরানে আমেরিকা-ইসরায়েলের সামরিক আগ্রাসন এবং দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতার প্রতিবাদে ‘মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পরিষদ’ আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে সংহতি বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য।

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, ‘বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)’-এর পক্ষে মো: শফি উদ্দিন কবির কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩, ০১৭১১-৪৪০২৬৫। website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org